গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৩য় বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা | শুক্রবার, ১লা জুন, ১৯৫১, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ | মূল্য—দুই আনা

★ ভারতবর্ষের শান্তি শিবিরের আত্মসমালোচনা ★

পশ্চিম বাংলা প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত শান্তি সম্মেলন হয়ে গেল; দেশের হাজার হাজার শান্তি সৈনিকের প্রতিনিধিরা একজোট হয়ে শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে নূতন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করলেন এবং সেই কার্য্যসূচিকে স্পষ্টভাবে রূপ দেবার জন্য স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতিও গড়লেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এই সব সম্মেলনে যোগদান করেছেন। এখন তাঁদের প্রত্যেকের আত্মসমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে চোখ ফেরাতে হবে সম্মেলনের দিকে, দেখতে হবে আগের চেয়ে কতটুকু আমরা এগিয়েছি; কি কি দোষ ত্রুটি এখনও থেকে গিয়েছে আর কেমন করেই বা সেই সব বাধা কাটিয়ে দেশ জোড়া জোরদার শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। নিজেদের কাজের এইরকম সচেতন আত্মসমালোচনাই শান্তি আন্দোলনকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে নয়ত আত্ম পরিতৃপ্তির ভাব নিয়ে চললে দোষ ত্রুটি কাটিয়ে জোর কদমে অগ্রসর হওয়া তো যাবেই না বরং বারবার পিছন থেকে টান পড়বে এবং ভ্রান্ত পথের গোলক ধাঁধাঁয় ঘোরাও অসম্ভব নয়। কোন আন্দোলনই নেতৃত্ব বিনা চলতে পারে না; শান্তি আন্দোলনের বেলাও একথা সত্যি। আর শান্তি আন্দোলনের মত বৃহত্তম যুদ্ধ বিরোধী শান্তিকামী গণশক্তির আন্দোলনের নেতৃত্ব কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষের নেতৃত্ব হতে পারে না; একে প্রধানতঃ হতে হবে সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলির মিলিত নেতৃত্ব। তাই শান্তি আন্দোলনে যোগদানকারী দলগুলির গুরুদায়িত্ব আছে শান্তি-আন্দোলনকে ঠিকভাবে পরিচালিত করার, তাই নিজেদের কাজের সমালোচনা ও আত্ম সমালোচনা করার প্রয়োজন আছে।

দেশের মধ্যে সত্যিকারের শান্তি আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে প্রত্যেকটি যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী গণতান্ত্রিক শক্তিকে এই আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনতে হবে। এই কারণেই বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের নির্দেশ হল; সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ এমন কি যুদ্ধের মূল কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ থাকা সত্বেও সমস্ত শান্তি-কামী জনসাধারণকে সমবেত করতে হবে শান্তিরক্ষার এক সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে। বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট ও শ্রমিক দলগুলিকে ঠিক এই পথে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন কমিনফর্ম. তাঁর ১৯৪৯ সালের নভেম্বরের 'যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে শান্তির সংগ্রাম' সম্পর্কিত প্রস্তাবে; তাতে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, "It is of the utmost importance to-day to unite all genuine peace supporters, regardless of religious beliefs, political views or party affiliation, on the broadest platform of fighting for peace and against the danger of a new war with which mankind is threatened." তা সত্বেও বর্ত্তমান সম্মেলনের কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত শান্তি কংগ্রেস যে নীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল তাহল একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের দলীয় নীতি; ফলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ শান্তির শক্তিকে টেনে আনার পরিবর্ত্তে তাদের শান্তি কংগ্রেস থেকে বাইরে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই দেশের শান্তি আন্দোলন পরিচালনার কেন্দ্রীয় সংগঠন শান্তি-আন্দোলনকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শক্তির ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব গড়ে ওঠার বদলে তা হয়ে পড়ল ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির অধীনস্থ, শান্তি আন্দোলন বৃহত্তম গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ হতে বিচ্যুত হয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির দলীয় আন্দোলনে পর্য্যবসিত হল।

বর্ত্তমান সম্মেলন এই সঙ্কীর্ণতা যথেষ্ট পরিমাণে কাটিয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। এইদিক থেকে বর্ত্তমান সম্মেলন সাফল্যের নিদর্শন। শান্তির সৈনিকদের চেষ্টায় আগের সঙ্কীর্ণতা ও দলীয় গোঁড়ামি অনেকাংশে কাটলেও, আমরা যেন আত্ম-পরিতৃপ্তির ভাবে ফুলে না উঠি। এখনও এদিক থেকে আমাদের যথেষ্ট ত্রুটি আছে; তবে আগে যেখানে ত্রুটিকে জিইয়ে রাখার ব্যবস্থা ছিল আজ তাকে দূর করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রয়োজন, সমবেত সংহত সজ্ঞান চেষ্টা। যদি একবার আমরা সম্মেলনের প্রতিনিধিদের শ্রেণী-গঠনের (class-composition) দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আমাদের দেশে শান্তি আন্দোলন এখনও প্রধানতঃ সহর ও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। যেখানে শান্তি আন্দোলনের মূল শক্তি শ্রমিক শ্রেণী, সেখানে আমাদের সম্মেলনে শ্রমিক প্রতিনিধি নেই বললেই হয়। যে দেশে জন-সংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ চাষী সেখানে আমরা কৃষক প্রতিনিধি বেশী জন পাইনি। এই অপূর্ণতার কারণ আমাদেরই জানতে হবে এবং তাকে দূর আমাদেরই করতে হবে। আমাদের এই অসম্পূর্ণতার প্রধান কারণ দেশের প্রতিটি কোণে আমরা শান্তি আন্দোলনকে পৌঁছে দিতে পারি নি।

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বোম্বাইয়ে ইউ, এস, ও, আই এর সভা

আগামী নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ ভাবে

★ প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার সিদ্ধান্ত ★

(সংবাদ দাতা)

গত ১৪ই মে হতে তিন দিন ব্যাপী বোম্বাইয়ে ইউ, এস, ও, আই এর ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক হয়। বৈঠকে আলোচনার বিষয় থাকে আগামী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের যুক্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উক্ত সভায় ইউ, এস, ও, আই এর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দল ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ছাড়াও ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ হতে কমরেড মিরাজকর, ফরওয়ার্ড কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফে কমরেড যোগলেকর, কেরেলা সোস্যালিষ্ট পার্টি, আর, সি, পি, আই (পান্না দাশগুপ্ত গ্রুপ) ও অরুণা আসফ আলির নেতৃত্বে নবগঠিত বামপন্থী সোস্যালিষ্টদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ইউ, এস, ও, আই, এই সমস্ত দলকে যোগদানের আবেদন করায় ফরওয়ার্ড কম্যুনিষ্ট পার্টি উক্ত সংস্থায় যোগদান করেছেন। বাকি চারটি দল লিখিতভাবে না জানালেও মৌখিকভাবে জানিয়েছেন, ইউ, এস, ও, আইয়ে যোগ দিতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই এবং শীঘ্রই লিখিতভাবে যোগদানের সিদ্ধান্ত তাঁরা জানাবেন।

ওয়ার্কিং কমিটি আরও এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন যে, ইউ, এস, ও, আই এর অন্তর্ভুক্ত কোন দল বা প্রতিষ্ঠান ইউ, এস, ও, আই এর বাইরে কারও সঙ্গে এমন কি নির্বাচন বিষয়েও আলাদা ফ্রণ্ট গঠন করতে পারবে না। এর ফলে বর্ত্তমানে যেমন আলাদা আলাদা গণতান্ত্রিক দাবীর ভিত্তিতে বিভিন্ন কমিটির অধীনে—স্থানীয় ভিত্তিতে আন্দোলন হচ্ছে তা বন্ধ হয়ে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে একটি গণমোর্চার নেতৃত্বে আন্দোলন হবে। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার সর্ব ভারতীয় গণমোর্চা গঠনের উদ্দেশ্যে এই আহ্বান বহু দিন ধরে দিয়ে আসছে। ইউ, এস, ও, আই কে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করার এই হল সঠিক কর্মপন্থা। সেই কর্মপন্থা এখন নেওয়া হল।

সভায় আরও ঠিক হয়েছে, সংস্থার কেন্দ্রীয় অফিস দিল্লী হতে বোম্বাইয়ে স্থানান্তরিত করা হক। কমরেড আর, এস, রুইকরের বদলে কমরেড ইন্দুলাল যাজ্ঞিককে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

নির্বাচনী ইস্তাহার রচনার জন্য একটি সাব কমিটি গঠিত হয়েছে এবং সভা স্থির করে, আগামী জুলাই মাসে ইস্তাহার বিবেচনার জন্য কার্য্যকরী সমিতির পুনরায় এক অধিবেশন হবে।

শান্তি শিবিরের আত্মসমালোচনা

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আজও তা সহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে; ফলে গ্রামে চাষীদের মধ্যে শান্তি সম্বন্ধে তেমন সাড়া জাগে নি। সহরাঞ্চলের শ্রমিকদেরকেও আমরা টেনে আনতে সক্ষম হই নি ব্যাপকভাবে, কারণ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে প্রচার তেমন হয় নি এবং শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য, যা শান্তি আন্দোলনের সফেল্যের পক্ষে অপরিহার্য্য, তা আমাদের দেশের শ্রমিক দলগুলি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। এই সব ত্রুটি কাটিয়ে উঠতে হলে কমিনফর্মের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রমিক দলগুলিকে নিম্নোক্ত কাজগুলি অবশ্যই করতে হবে।

শান্তি আন্দোলনকে সার্থক করে গড়ে তুলতে হলে কম্যুনিষ্ট ও শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে শ্রমিক শ্রেণী উত্তরোত্তর আরও বেশী করে আন্দোলনে যোগ দেয়, যাতে করে তলা হতে শ্রমিক ঐক্য গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন বিভাগের শ্রমিকদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ-ভাবে স্থানীয় ভিত্তিতে শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। এক কথায় শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এখন যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান তাকে দূর করে শ্রমিক শ্রেণীকে সংহত করতে হবে। কিন্তু তা করতে হলে আরও কয়েকটা বিষয় না করে উপায় নেই। ঐতিহাসিকভাবে একথা আজ একান্তভাবে সত্য যে আমাদের দেশের কম্যুনিষ্টরাই নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন। কথাটা অদ্ভুত শোনালেও সত্য, অতীব সত্য। শুধু যে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি আজ অন্তর্দ্বন্দ্বে ও গ্রুপ নীতির আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন তাই নয়। কম্যুনিষ্ট পার্টি ছাড়াও ভারতবর্ষে সাচ্চা কম্যুনিষ্ট দলের অভাব নেই। মুখে এদের অকম্যুনিষ্ট বা সোস্যাল ডিমোক্র্যাট বা দালাল বললেই —যা এতদিন কম্যুনিষ্ট পার্টি বলে আসছিল এবং এখনও বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলছেন —এরা তা হয়ে যায় না। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্বে এরা সকলেই বিশ্বাসী, কম্যুনিষ্ট পার্টির জন্ম হতে ধারাবাহিক ভুলের ইতিহাস এদের ভিন্ন কম্যুনিষ্ট দল গড়তে বাধ্য করেছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির ক্রমাগত ভুলের কারণ তার দল গঠনের অমার্কসীয় পদ্ধতি; তাই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই নতুন করে ভারতে সাচ্চা কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করতে হচ্ছে। সোস্যা-লিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার এই কথাই মনে করে। অন্যান্য দলের এই ধারণা কারণ তা না হলে নতুন করে দল রাখার অর্থ সাম্যবাদী শিবিরে ফাটল ধরান। শ্রমিক ঐক্যকে সফল করতে হলে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী অংশ, এই সব আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্বে বিশ্বাসী দলগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর বোঝাপড়া ও ঐক্যবদ্ধতা পয়দা করতে হবে। এবং তা করতে হলে এ সব দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সংযুক্ত রাজনৈতিক বোর্ড গড়তে হবে, যার অধীনে প্রাদেশিক বোর্ড হতে প্রাথমিক বোর্ডগুলি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করবে। এই আন্দোলনে যেমন নিজেদের মধ্যে মতবাদিক বিভিন্নতা দূর করার জন্য সাধারণ কর্মীদের নিয়ে গঠিত সভায় পলিমিকাল আলাপ আলোচনা, ঐক্যবদ্ধ সম্পাদনায় পত্রিকা প্রভৃতি প্রকাশ থাকবে তেমনি ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষাণ, ছাত্র, বাস্তহারা প্রভৃতি ফ্রন্টে মিলিত ব্যবহারিক কাজও থাকবে। এইভাবে মতবাদিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সংভাবে যদি কাজ করা যায় তাহলে যে শুধু ঘনিষ্ঠ-তর সমাজতন্ত্রী ঐক্য গড়ে উঠবে তাই নয়, কালক্রমে সারা ভারতে একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্যবাদী দল জন্মও নিতে পারে। এই ঘনিষ্ঠতর সমাজতান্ত্রিক ঐক্যের চেষ্টার ফলে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ সভা প্রভৃতি গুলির মিলন সম্ভব হবে। শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা তথা বিরাট শান্তি আন্দোলন পরিচালনা করার পক্ষে তা এক অতি দরকারী ধাপ নিঃসন্দেহে। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডিমোক্র্যাট নেতৃত্বকে শ্রমিক শ্রেণী হতে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে শ্রমিক ঐক্য গড়ে তোলা সফল হবে না। তাই নির-বিচ্ছিন্ন ও অক্লান্তভাবে মতবাদিক ও সাংগঠনিক সংগ্রাম চালাতে হবে যুদ্ধ-বাজদের ভাড়াটে দালাল, এই সব জয়-প্রকাশী লোহিয়া মেতা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এবং এদের অধীনস্থ সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় আন্দোলনের মারফৎ ঐক্য-বদ্ধতা গড়ে তুলতে হবে। কাজটি কঠিন সন্দেহ নেই; কিন্তু এ না করে অন্য পথ নেই এবং কম্যুনিষ্ট হিসাবে যত বাধা, অসুবিধা দেখা দিক তা আমাদের করতেই হবে। অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, এ কথা সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার দীর্ঘ দিন ধরে বলে আসা সত্ত্বেও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্বে বিশ্বাসী দলগুলি, বিশেষ করে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি, এতে সাড়া দিচ্ছেনা। শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য চাই কিনা—তার প্রমাণ এই কাজের মধ্যেই দিতে হবে। মুখে শুধু ঐক্য ঐক্য বলে চেঁচালে ঐক্য কোন দিনই হবে না; ঐক্য গড়তে হলে ঐক্য গড়ার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। সেই পদ্ধতিই মোটামুটিভাবে এস, ইউ, সি, উপস্থাপিত করেছে।

তারপর কমুনিষ্ট ও শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলির কর্ত্তব্য হচ্ছে যুদ্ধবাজদের সমস্ত রকম যুদ্ধচক্রান্ত, প্রচার প্রভৃতিকে বানচাল করে দেওয়া। জনশক্তিকে চিনিয়ে দিতে হবে কারা যুদ্ধ বাধাতে চাচ্ছে, কেন চাচ্ছে; যুদ্ধ বাধলে গণজীবনে কি দুর্যোগ নেমে আসবে সে চিত্র ভালভাবে উদ্ঘাটিত করে দিতে হবে। এখানে কোন রকমে জোড়াতালি দেওয়া উচিত নয়, এমন কি ঐক্যবদ্ধতার অজুহাতেও নয়। ভুলে গেলে চলবে না ঐক্যবদ্ধতা আমরা চাই ঐক্যবদ্ধতার জন্য নয় শক্তিশালী শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। সুতরাং সত্যকে চাপা দিয়ে গেলে চলবে না। 'শান্তি কংগ্রেস কোন বিশেষ চিন্তার প্রচারক হবে না'—জোলীয় কুরীর এই কথার মানে এই নয় যদি কোথায় জনতা বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝে থাকে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ বাধায় তাদের শ্রেণী স্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এবং সে কথার প্রচার দাবী করে কংগ্রেস বা কমিটির কাছে তাহলেও তা বলে দেওয়া হবে না। বরং যেহেতু শ্রমিক শ্রেণী শান্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে সেই হেতু সে সর্বদাই চেষ্টা করবে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীদের যুদ্ধবাজরূপ জনতার সামনে খুলে ধরতে। কংগ্রেস প্ল্যাটফরম হতে তা সম্ভব না হলে বাইরে থেকে বলতে হবে। শান্তি কংগ্রেসের প্ল্যাটফরম হতে এ কথা বলতে যে আপাত্ত নেই তা বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের বার্লিন অধিবেশনে বিভিন্ন বক্তার রিপোর্টই প্রমাণ করে। নিজ নিজ মত প্রকাশের এবং সেই মত অন্যকে বোঝাবার অধিকার প্রত্যেকের আছে। শ্রমিক শ্রেণীরও তা আছে। সুতরাং স্বভাবতই কম্যুনিষ্ট ও শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলির প্রতিনিধি এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ব্যক্তিরাই কংগ্রেস প্ল্যাটফরম হতে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধবাদী রূপ প্রকাশ করে দেবে। কেউ যদি মনে করে সাম্রাজ্যবাদীরা শান্তি রক্ষা করছে সে তাও বলতে পারে অথচ শান্তি কংগ্রেসে লক্ষ্য করা গেল ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সমস্ত বক্তা সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধবাদী একথাটা বলতেই রাজী নন। যদি তাঁরা বিশ্বাস করেন সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধবাধাতে চাচ্ছে, তাহলে অবশ্যই তাঁদের সে কথা জনসমক্ষে বলা উচিত। যদি দেখা যায় শান্তি কংগ্রেসে এমন শক্তি আছে যারা এ কথাগুলি বিশ্বাস করে না তাহলে এই চিন্তা ঐক্যের খাতিরে প্রস্তাবে গৃহিত না হতে পারে। কিন্তু কমুনিষ্ট হিসাবে বাখা, প্রচার ও আন্দোলনের মারফৎ জনতাকে এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে। এর বদলে লক্ষ্য করা গেল কমুনিষ্ট পার্টিই সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধবাদী বলে প্রচার করতে সবচেয়ে অপরাগ। এ দোদুল্য-মানতা কেন? একি Unity fettshism না সত্য প্রকাশে দ্বিধা?

তৃতীয়তঃ আর একটা বিষয় যেটা চোখে পড়ে তা হল শান্তি আন্দোলনের রূপ নিয়ে। ভারতবর্ষে শান্তি আন্দোলনের বর্ত্তমানে নেতাদের মধ্যে এমন একটা ধারণা আছে যে আমাদের দেশের শান্তি আন্দোলনের রূপ ও ধারা বিশ্ব শান্তি কংগ্রেস যা বলছে তার বাইরে যেতে পারে না। এই চিন্তাটা ঠিক নয় এবং আন্দোলন সম্বন্ধে যান্ত্রিক ধারণাই প্রকাশ করে দ্বান্দিক নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থার জন্য আন্দো-লনের রূপ ও ধারা ভিন্ন হতে বাধ্য এই সত্যটি ধরতে না পারলে গতানুগতি-কতা দেখা দেবে এবং আন্দোলনকে দুর্বল করা হবে। এই কারণেই কমিনফর্ম বৈঠকে কমরেড, সুসলভ হুঁসিয়ারী দিয়ে বলেছিলেন—"It goes without saying that measures in defence of peace must not be standardised and stereotyped, that the concrete Condition in each country must be taken into account, and diverse forms and methods of the movement must be skilfully combined with the general task." রূপের পার্থক্য হলেই লক্ষ্য আলাদা হয়ে যায় না। বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের নির্দেশ সাধারণ নির্দেশ; সেই নির্দেশকে জাতীয় ক্ষেত্রের অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।

চতুর্থতঃ কমুনিষ্ট ও শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলির প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে শান্তির সংগ্রামকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া, জনতার গণতান্ত্রিক দাবীর লড়াই ও শান্তির লড়াই যে পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত তা জনসাধারণকে বোঝান। কমিনফর্ম তাই তাঁর শান্তি প্রস্তাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন —"The Communist and working Class parties in the Capitalist Countries consider it their duty to merge into one the struggle for national independence and the struggle far peace, indefatigably to expose the anti-

শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়

চেকোশ্লোভাকিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির দীর্ঘ ৩০ বছরের গৌরবময় ইতিহাস

★ গত ১৪ই মে চেকোশ্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টি ৩১ বছরে পদার্পন করল। এস, ইউ, সি এই উপলক্ষে চেকোশ্লোভাক জনতা ও তাদের নেতা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সাদর অভিনন্দন জানাছে। —সম্পাদক, গণদাবী।

সুদীর্ঘ তিরিশ বছর আগে ১৯২১ সালের ১৪ই মে চেকোশ্লোভাকিয়া দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়। গোটা সোস্থাল ডেমোক্রাটিক পার্টির তিন ভাগের দু'ভাগ সদস্য যাঁরা বামপন্থী মতাবলম্বী ছিলেন তাঁরা পার্টি কংগ্রেসে এই দিনটিতে কম্যুনিষ্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিক (Third International) এ যোগ দেন।

এবার জুবিলী উৎসব পালন করতে গিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রতি অগ্রসরমান চেকোশ্লোভাকিয়ার নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তার অগ্রগামী অংশ কম্যুনিষ্ট পার্টি গত তিরিশ বছরের স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক কার্য্যসমূহকে গৌরবের সাথে স্মরণ করছে।

১৯১৭ সালের যে মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী রাজতন্ত্রের লৌহশৃঙ্খলকে ভেঙ্গে ফেলতে এবং শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনের মারফৎ চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রজাতন্ত্রের অভ্যুত্থানকে সাহায্য করেছিল চেক-কম্যুনিষ্ট পার্টি আজ তাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। মহান অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য এবং লেনিন ষ্ট্যালিনের চিন্তাধারায় অনুপ্রানিত হয়ে চেক-শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী কর্ম্মীরা সাম্যবাদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল এবং ১৯১৯-২০ সালেই সমাজতান্ত্রিক-প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু ১৯২০ সালের এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে স্তোসাল ডেমোক্রাটিক দক্ষিণপন্থী নেতারা প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে হাত মিলিয়ে জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা করে ধ্বংস করে দিলেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রথম পরাজয় বরণ করল। কিন্তু এই পরাজয়ই পরবর্ত্তী বিজয়ের পথকে সুপ্রসস্থ করেছিল। ১৯২০ সালে সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার প্রত্যুত্তরে কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনের দাবীতে সারা দেশে এক বিরাট আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের ২১ দফা সর্ত্তসমূহকে গ্রহণ করার দাবী এক গণভোটে রূপান্তরিত হ'ল। সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বাম-পন্থীদের দ্বারা আহুত কংগ্রেসে যেটা ১৯২১ সালে ১৪-১৭ মে প্রাগে [illegible] প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল। এর এক মহান ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য রয়ে গেছে।

১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত ঐক্য কংগ্রেসে (Unity Congress) বিপ্লবী চেক, শ্লোভাক, জার্মান, হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড ও অন্যান্য দেশের শ্রমিকরা চেকোশ্লোভাকিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টির আন্তর্জাতিক পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল।

এইভাবেই বোহুমির স্মিরাল, এন্টনী জ্যাপেটেক, জোসেফ হাকেন প্রভৃতি নামের সাথে জড়িত এবং বৃহৎ জনসাধারণের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত চেক দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। পার্টির নেতৃত্বে চেক দেশের শ্রমিক শ্রেণী, নিজেদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে রুশ দেশের বলশেভিকদের মত বৈপ্লবিক কার্য্যক্রম ও নীতি গ্রহণ করেছিল।

আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর মহান নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন ১৯২১ সালে সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকের তৃতীয় অধিবেশনে চেকোশ্লাভাকিয়ার নবগঠিত কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্দেশ্যে বামপন্থী বিচ্যুতিকে ত্যাগ করে সঠিক গণআন্দোলনের পথে এগিয়ে যাবার যে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, পার্টি আজ তাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত পার্টির প্রথম স্তর শক্তিশালী গণ-আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলসমূহকে সোশাল ডেমোক্রাটিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার প্রচেষ্টায় অতিবাহিত হয়েছে। বেশ কিছু দিন ধরে সোশাল ডেমোক্রাটিক প্রচারের পুনরভ্যুত্থান, যেটা পার্টির বৈপ্লবিক উন্নতিকে বাধা দিয়েছিল সেটা পার্টির এক সঙ্কার কারণ হিসাবে রয়ে গেল। সর্বপ্রকার সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে পার্টিকে বলশেভিক ধারায় পরিণত করার সংগ্রামে চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি দু-দু'বার ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল ; এই সমস্যা পার্টির একতা এবং বনিয়াদকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। ১৯২৫ সালের প্রথম সমস্যার সময়ে কমরেড ষ্টালিনের মহান সাহায্যের কথা পার্টি ভুলবে না। ১৯২৫ সালের মার্চ মাসে কার্য্যকরী সমিতির বর্দ্ধিত প্লেনাম বৈঠকে ষ্টালিন ব্যক্তিগতভাবে চেক কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ভাঙ্গনের মুখ হ'তে রক্ষা করে বলশেভিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সেই সময় বহু কর্ম্মী লেনিন ষ্ট্যালিনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রতি সবিশেষ আনুগত্য নিয়ে বলশেভিক মতবাদকে গভীরভাবে উপলব্ধির দাবীতে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদে আরোও দৃঢ়ভাবে সংগঠিত হচ্ছিলেন। এই সমস্ত নৃতন কর্ম্মীদের সর্ব্বাগ্রে ছিলেন কমরেড গটওয়াল্ড ; তিনি পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে তিনি সর্ব্বপ্রথমে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। বলশেভিক কর্মীদের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি পার্টিকে পুরাতন সোশাল ডেমোক্রাটিক সুবিধাবাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় কাজ করল। ১৯২৯ সালে চরম বিশ্বাসঘাতক ও সুবিধাবাদী জিনোভিয়েভ-ট্রটস্কীপন্থী কর্মীরা পার্টিকে ভেঙ্গে ফেলবার যে ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছিল সেটা পার্টির ইতিহাসে দ্বিতীয় সমস্যা হিসেবে দেখা দিল। ' বলশেভিক কর্মীবৃন্দ একতা রক্ষার জন্য এবং আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত কর্মপন্থাকে কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে দৃঢ়ভাবে আন্দোলন চালাতে লাগল। ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চেক-কম্যুনিষ্ট পার্টির পঞ্চম ঐতিহাসিক কংগ্রেসে কমরেড গটওয়াল্ডকে শীর্ষে স্থাপন করে পার্টিতে এক নূতন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। ভবিষ্যতে সকল সংগ্রামে জয়ী হবার এবং পার্টিকে সত্যিকারের সাম্যবাদী পথে পরিচালনার ভার এই নূতন নেতৃত্বের হস্তে অর্পিত হয়েছিল।

১৯২৯ সালে প্রথম স্তর অতিবাহিত হলে পার্টি জঙ্গী বিপ্লবী কার্য্যক্রম গ্রহণ করে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ পর্য্যন্ত যখন এদেশের পুঁজিবাদ নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত ছিল পার্টি তখন শ্রমিক-শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে এক মহান নেতৃত্ব দিয়ে এসেছিল। জার্মাণীতে হিটলারের ক্ষমতা দখলের পর চেক-কম্যুনিষ্ট পার্টি রুজি ও রুটির সংগ্রামকে ফ্যাসিবাদ ও ভয়াবহ যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে যুক্ত করেছিল। এই সময়েই কর্মীদের বলশেভিক ও সংগ্রামী মনোভাবের পরীক্ষা প্রতি পদে দিতে হয়েছিল এবং এর ভেতর দিয়েই পরবর্ত্তীকালে পার্টিকে সাহসীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষমতা সম্পন্ন কর্মীবৃন্দ তৈরী হয়েছিল।

১৯৩৫ সালে জার্ম্মাণ ফ্যাসিবাদ যখন চেকোশ্লোভাকিয়াকে আক্রমণের [illegible] করল তখন কম্যুনিষ্ট পার্টি দেশ এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এগিয়ে আসল। আন্তর্জাতিক সপ্তম কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করে ১৯৩৬ সালে চেক-কম্যুনিষ্ট পার্টি সপ্তম কংগ্রেসে চওড়া গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কার্য্যক্রমকে গ্রহণ করে। পার্টি জনগণকে বুঝিয়েছিল যে একমাত্র পার্টির জঙ্গী শক্তিই প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারে।

বুর্জোয়া শ্রেণীর জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ নীতির বিরুদ্ধে এবং জার্মাণ ফ্যাসিবাদকে দমন করার জন্য পার্টি বৃহত্তর জনসাধারণকে সংগঠিত করেছিল। পার্টি জনসাধারণকে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহায়তায় সংগ্রামের পথ দেখিয়েছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে যখন পশ্চিমী শক্তিসমূহ চেকোশ্লোভাকিয়াকে জঘন্যভাবে ভাগ বাটোয়ারা করছিল, যখন দেশের ধনিকশ্রেণী চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে; যখন দেশের ভবিষ্যত রক্তপিপাসু হিটলারের হস্তে নির্ভর করছিল তখন একমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টি সোভিয়েটের সহায়তায় জনগণের স্বাধীনতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে এগিয়ে গিয়েছিল। এক কম্যুনিষ্ট পার্টিই ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বরে মিউনিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং প্রজাতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য একমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টিই অবিরাম সংগ্রাম করে এসেছে। এই জন্যই পার্টিকে চেক-জনসাধারণের গণ-আন্দোলনের নেতা বলে অভিহিত করা হ'ত।

১৯২৯ থেকে ১৯৪৫ পর্য্যন্ত চেকোশ্লোভাকিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টির এক বীরত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়। শ্রমিকশ্রেণী এবং মেহনতী লোকের জঙ্গী দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে রূপ দিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি তার সমস্ত শক্তি চেক-জনতার স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত করেছিল। বীর শহিদ এবং বীর যোদ্ধাদের সম্মানের পতাকা ছিল আবৃত। দেশের সমস্ত অঞ্চলেই জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্ট ও তাদের অনুচর দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে কম্যুনিষ্ট পার্টি একাকী প্রতিরোধ করেছিল। জার্মাণ ফ্যাসিবাদের নৃসংশতার ভয়ে ছ'বছর পার্টিকে গোপনভাবে কাজ চালাতে হয়েছে। প্রত্যেকটি বীরত্বপূর্ণ কার্য্যাবলী প্রচুর আত্মত্যাগের সাড়া সৃষ্টি করেছে। পঁচিশ হাজার সভ্যকে সংগ্রামী ক্ষেত্রে এবং জার্মাণ ফ্যাসিবাদের কারাগারে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। চেক-কম্যুনিষ্ট পার্টি, সোভিয়েট ইউনিয়ন এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ওদেশ থেকেই যে ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগীতা করেছিল তার জন্য গভীর [illegible] আন্দোলনকে সোভিয়েট ইউনিয়নের দুর্দ্ধর্ষ

শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায় দেখুন

ডিগওয়াদি সংস্কৃতি সংঘের উদ্যোগে
★ সংস্কৃতি সম্মেলন ★
সাংস্কৃতিক ধারা ও রূপান্তরের উপর সুবোধ ব্যানার্জীর মনোজ্ঞ বক্তৃতা
ভারতে যুদ্ধবাদী ইয়াঙ্কি কালচারের বিরুদ্ধে হুঁসিয়ারী

(সংবাদ দাতা)

ডিগওয়াদি, (বিহার) ২১শে মে :-

গত ১৯শে মে তারিখে ডিগওয়াদি সংস্কৃতি সংঘের উদ্যোগে সংঘের গৃহে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতার প্রখ্যাত অধ্যাপক, শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সম্মেলন উদ্বোধন করার কথা ছিল; কিন্তু তিনি না উপস্থিত হওয়ায় গণদাবীর প্রধান সম্পাদক, সুবোধ ব্যানার্জী উদ্বোধন কাজ সম্পন্ন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিরূপণ করে বর্ত্তমানে সংস্কৃতি আমাদের দেশে কি রূপ নিয়েছে তা বর্ণনা করেন। তিনি বিশেষভাবে ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, বিভিন্ন সময়ে প্রধান শ্রেণী চিন্তা কেমন করে সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে, সাহিত্য কেন গণমানস হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ড্রয়িংরুম সামগ্রী হয়েছে, গণকৃষ্টি গড়ে তুলতে হলে দেশের জনতাকে—শ্রমিক, চাষী, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়কে—কি করতে হবে তা বিশদভাবে আলোচনা করেন। সর্বশেষে তিনি শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক কি তা আলোচনা করতে গিয়ে ভারতবর্ষে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের সমর্থকরা যে যুদ্ধবাদী ইয়াঙ্কি কালচার প্রচার করছে তার সম্বন্ধে হুঁসিয়ারী দেন এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের আবেদন জানান।

কমরেড ব্যানার্জীর বক্তৃতার পর স্থানীয় কয়েকজন সভ্য তাঁদের স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ এবং আবৃত্তি করেন। ইহার মধ্যে শ্রী বিশ্বনাথের "মালকাটার" কবিতাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতঃপর সভাপতি তাঁর অভিভাষণ দেন। তিনি সংস্কৃতির অগ্রগতির পথ হিসাবে প্রকৃত মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কথা বলেন। রাত্রি ১০ টার সময় সুগায়ক তুলশীবাবুর গণসঙ্গীতের পর প্রথম দিনের সভা শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনে সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন গায়ক ও গায়িকা উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে তাঁদের গানে পরিতৃপ্ত করেন। সংঘের সভাপতি অজয় মল্লিক ও সম্পাদক অনিল সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিকাল ইনষ্টিটিউটে ব্যাপক ছাঁটাই
৪০০জন কর্মচারীর উপর নোটিশ জারি
১৫।১৬ বছরের পুরান কর্মচারীও বরখাস্ত

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের ফিল্ড বিভাগের প্রায় ৪০০ কর্মচারীর উপর ছাঁটাই এর এক নোটিশ জারি হয়েছে। গত মার্চ মাসে যে নোটিশ জারি হয়েছিল সাম্প্রতিক নোটিশে তাকেই সমর্থন করে বলা হয়েছে, ১লা জুন হতে এই সব নোটিশ-প্রাপ্ত কর্মচারীদের বরখাস্ত করা হবে। ছাঁটাই কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেরই চাকুরী ১৫।১৬ বছরের বেশী।

বহুকাল ধরে ইনস্টিটিউটের এই সব কর্মচারীদের দ্বারা কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি প্রাদেশিক সরকার প্রত্যেকেই ফসল সার্ভে, উদ্বাস্তু সার্ভে, অর্থনৈতিক সার্ভে প্রভৃতির কাজ করাতেন। বর্ত্তমান পশ্চিম বাংলা সরকার নিজের স্ট্যাটিষ্টিকাল ব্যুরোর মারফৎ এই সব কাজ করাবেন বলে স্থির করায় পুরাণ কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। একদিকে পুরাণ কর্মচারীদের বরখাস্ত, অন্যদিকে ব্যুরোর কাজের জন্য নতুন নতুন নিজের লোক নিযুক্ত করা চলেছে

সরকারের এই অন্যায় নীতির প্রতিবাদে ষ্ট্যাটিষ্টিকাল ইনষ্টিটিউটের কর্মচারীরা সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন। তাঁদের দাবী—যে সমস্ত কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হবে তাদের ষ্টেট ষ্ট্যাটিষ্টিকাল ব্যুরোতে নিয়োগ করতে হবে।

জনতার কণ্ঠরোধের সরকারী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ুন
ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার কাজে মহল্লায় মহল্লায় গ্রামে গ্রামে সভাসমিতি
গণ স্বাক্ষর প্রতিবাদ আন্দোলনের আওয়াজ তুলুন

ভারতীয় গঠণতন্ত্রের ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কিত ১৯ ধারা এবং প্রেস আইন বদলান হচ্ছে। ভারতীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের জননেতারা সরকারের এই অপচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিবাদ মারফৎ এই জুলুমকে রোখা যাবে না; তার জন্য চাই সারা দেশব্যাপী গণআন্দোলন। সুতরাং প্রতি গ্রামে, মহাল্লায়, বস্তীতে, স্কুলে কলেজে সভাসমিতি করে সরকারী অপচেষ্টার প্রকৃত কারণ এবং জনজীবনের ওপর তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বুঝিয়ে দিতে হবে। সরকারের এই ফ্যাসিবাদী নীতির বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করার মাধ্যমে জনতাকে রাজনৈতিক সচেতন করে তুলে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং সেই আন্দোলন পরিচালনার জন্য স্থানীয় ইউ. এস. ও. আই কমিটি গঠন করতে হবে।

কংগ্রেস ক্ষমতা হস্তগত করার আগে ১৯৩১ সালে একটি ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটি গঠিত করেছিল। সেই কমিটি ব্যক্তিস্বাধীনতার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এই রকম —"ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং আইন ও নীতি সম্মত উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হবার স্বাধীনতা থাকবে।" আজ সে প্রতিশ্রুতি ভেসে গিয়েছে। হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী কংগ্রেসী নেতাদের মতে মত দিতে না পারায়, তাঁদের চোরাকারবারী দেশ ও সমাজদ্রোহী নীতির সমর্থক না হতে পারায় কিংবা ভিন্ন মত পোষণ করার জন্য বিনাবিচারে কারাদণ্ডিত ও অন্তরীণ আবদ্ধ; অসংখ্য সংঘ ও প্রতিষ্ঠান লুপ্ত: সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

যে গঠণতন্ত্র ভারতীয় গণপরিষদে গৃহীত হয়েছিল তার অসংখ্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যেহেতু আদালতের বিচারে রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পেয়েছে তাই নতুন করে গঠণতন্ত্র পালটান হচ্ছে যাতে করে সরকার ইচ্ছামত তার বিরুদ্ধবাদীদের বিনা বিচারে বন্দী করতে পারে। জনমত সংগঠনে সংবাদপত্রের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। বৃটীশ শাসনের আমলে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী প্রেস আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেছিল, কংগ্রেস তখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা বলেছিল। আর ক্ষমতা পাবার পর শুধু যে আগের আইনগুলি টিকিয়ে

রাখা হ'ল তাই নয়, নতুন করে সংবাদপত্রের ওপর আঘাত হানা হল। সরকারের এমনই গণতন্ত্রপ্রীতি যে অদলীয় তিন চারটি সংবাদপত্র এক পশ্চিম বাংলায় সরকারী আঘাতে বন্ধ হয়ে গেল। এত শক্তি থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসী নেতারা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই নতুন করে আবার প্রেস-আইন বদলান হচ্ছে।

এ সবের উদ্দেশ্য যে বিরুদ্ধবাদীদের গলা টিপে মেরে আগামী নির্বাচনের তরে যাওয়া—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সরকারের এই চণ্ডনীতির প্রতিবাদ জনতাকে নিজ স্বার্থেই করতে হবে। দৈনন্দিন খাওয়া পরার আন্দোলনের সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মারফৎ নিজেদের দাবী আদায় ও রক্ষা করতে না পারলে বর্ত্তমানে যে দুরবস্থা চলছে তার হাজার গুণ বেশী খারাপ অবস্থা দেখা দেবে। এই কথা বুঝে এগিয়ে এসে আন্দোলন গড়ে তুলুন।

পড়ুন
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের
ইংরাজী মুখপত্র
Socialist Unity
৪৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩

গান্ধীভক্তদের ত্যাগের বহর

হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ ও সেই সঙ্গে ত্যাগের মহিমা প্রচার

গান্ধীপন্থী নিষ্কাম আশ্রমবাসীরা ভারতবর্ষের আদর্শ হিসাবে সাধারণ জীবন যাপন ও উচ্চ চিন্তার কথা বহুকাল ধরে প্রচার করে আসছেন। রাজা গোপাল, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি নামকরা গান্ধীভক্তদের plain living এর পরিচয় গরীব ভারতবাসী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। মাইনে আর ভাতা হিসাবে কয়েক লাখ টাকা নিয়েও তৃপ্তি হয় না এঁদের। ঘর দোর সাজানো কার্পেট প্রভৃতি দিয়ে মুড়তে, বাড়ীর সামনে লনে ফুলের তদ্বির করতে এঁরা কয়েক লাখ বছরে খরচ করেন। তার ওপর ধর্মকর্ম আছে। বাইরে যেতে আত্মসম্মানে বাধে; সুতরাং ঘরে বসেই যাতে সাধন ভজন আর রাম নাম করা যায় তার জন্য বেশ কয়েক লাখ টাকা খরচ করে মন্দির গড়া হয়। এর পর আর কোন রকমেই প্রশ্ন উঠতে পারে না এঁদের সাধারণ জীবন যাপন সম্বন্ধে।

এই সব মহামান্য নেতা ছাড়াও আর এক জাতের গান্ধীভক্তের দল আছেন। এঁরা কেউ জীবনে দাড়ি কামান না, কেউ বেগুন আর পালমশাক সেদ্ধ খেয়ে জীবন যাপন করেন, গীতা আর রামনামামৃত পানে বিভোর, আশ্রমবাসী। এঁদের ওপর ভারতবাসীর গভীর ভক্তি। কলিকাতার একটি সাপ্তাহিক এঁদের কয়েকজনের Plain livingএর কিঞ্চিত পরিচয় দিয়েছেন। জনসাধারণের তা জানা দরকার কারণ তাহলেই গান্ধী ভক্ত—ডুজাতেরই—আসলরূপ বুঝতে সুবিধে হবে; রামরাজত্ব যে আদতে লুটের রাজত্ব তা পরিষ্কার হবে।

শ্রীমতী সুশীলা নায়ার গান্ধীজীর একজন মস্ত ভক্ত আশ্রমবাসিনী, সারা জীবন গান্ধীজীর সেবা করে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন! সম্প্রতি, ফরিদাবাদের চিফ মেডিকেল অফিসার লেঃ কর্ণেল ডোলাকে নানা ছুতা নাতায় সরিয়ে ঐ স্থান দখল করেছেন তিনি। বেতন [illegible] ১১৫০ টাকা; শ্রীমতী নায়ার আরও ২৫০ টাকা বেশী নিচ্ছেন যদিও প্রথমোক্ত জন ২৫ বছর চাকুরীর পর এই বেতন পেতেন। দ্বিতীয় জন গান্ধীজীর সেক্রেটারী পিয়ারীলাল। তাঁর বাসস্থানের জন্য একটা বিরাট বাংলো দিল্লীর ভাঙ্গি কলোনীতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে সর্বত্যাগীর মন উঠলোনা, দিল্লীর একটি বিরাট বাড়ী তাঁর পছন্দ। সুতরাং সেখান হতে উদ্বাস্তু পরিবারকে জোর করে উঠিয়ে (পাবলিক পারপাসের অজুহাতে) তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল। তৃতীয় জন গান্ধীপোষ্য সুধীর ঘোষ তিনি লণ্ডনে পাবলিক রিলেসান্স অফিসার হবার পর এমন সব কাণ্ড করতে আরম্ভ করলেন যে বাধ্য হয়ে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হয়। করা হল তাঁকে ডেপুটি রিহাবিলিটেশন অফিসার। এখন তিনি ফারিদাবাদে ডেভালাপমেণ্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান। পদটি পেয়েই তিনি হাসপাতালের তরুণ লেডী ডাক্তারকে সরিয়ে দিয়ে নিজের স্ত্রী ও এক বন্ধু পত্নীকে নিযুক্ত করেছেন, অবশ্য আগের জনেদের চেয়ে বেশী মাইনেতে। ধন্য গান্ধীশিক্ষা, ধন্য তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যরা।

★ কংগ্রেসী সততার নমুনা ★

গান্ধী ফাণ্ড হতে আড়াই লাখ টাকা

বেকসুর গাপ

আই, এন, এ, ফাণ্ডের ১৫ লাখ টাকার হিসাব নেই

৩০ হাজার টাকা ঘুষ কিংবা লাখ লাখ সরকারী টাকা চুরি করলেও সাজা হয় না

সততাই কংগ্রেসী রামরাজত্বের নীতি—এই কথা শুনে শুনে ভারতবাসীর কানে তালা লাগার জোগাড় হয়েছে। জন সাধারণ নীতিশূন্য হয়ে পড়েছে, তাদের নীতিজ্ঞান ফিরিয়ে আনতে হবে, এরকম উপদেশামৃত শোষিত ভারতবাসীর ওপর অবিশ্রান্তভাবে বর্ষিত হচ্ছে খোদ কংগ্রেস সভাপতি রাষ্ট্রপতি আর চাই-চাই নেতা হতে চুনো পুঁটীদের শ্রীমুখ হতে। অথচ এই সব মহারথীরা কি রকম সাধু ও সৎ তা বলে বর্ণনা করা যায় না।

বিন্ধ্য প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলী ১৯৪৮ সালে গান্ধীফাণ্ডে মোটা টাকা জোর জবরদস্তি করে চাঁদা তোলেন। কিন্তু সেই টাকা ফাণ্ডে জমা দেবার বদলে তাঁরা বেমালুম গাপ করেন। অবশেষে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ সেই টাকা আনতে রেওয়া গেলে মন্ত্রীরা মহামুশকিলে পড়ে যান এবং সরকারী ট্রেজারী হতে ২ লাখ ৫১ হাজার টাকা তুলে রাজেন্দ্র প্রসাদকে দেন। প্রায় এক বছর পরে সরকারী অডিটের সময় এই কেচ্ছা ধরা পড়ে। অথচ আজ পর্য্যন্ত সরকারী টাকা মারা সত্ত্বেও এই সব লোকের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তি মূলক ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয় নি।

আই, এন, এ ফাণ্ডের বেলায়ও এই অবস্থা। সর্দার প্যাটেলের চেয়ারম্যানশিপের নেতৃত্বে এই ফাণ্ড গঠিত হয়। তাঁর সুযোগ্য পুত্র দয়াভাই প্যাটেল ও কন্যা মনিবেন প্যাটেল এর সঙ্গে নানা বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সম্প্রতি All India INA Enquiry and Relief Committeeর এক সভায় ফাণ্ড নিয়ে আলোচনা কালে জানা যায় যে ২৯ লাখ টাকা ফাণ্ডের মধ্যে ১৩ লাখ ৮৫ হাজার টাকার কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া বাংলা হতে যে ২ লাখ টাকা পাঠান হয়েছিল সর্দারের কাছে তাও খাতায় জমা দেখা যাচ্ছে না। জনসাধারণের টাকার উপযুক্ত হিসাব রক্ষা করা হয়েছে বলতে হবে!

এ ছাড়া বিন্ধ্য প্রদেশের জনৈক মন্ত্রী দিল্লীতে ৪০ হাজার টাকা ঘুষ খাওয়ার সময় হাতে নাতে ধরা পড়েন। তিনিও বেকসুর মুক্ত। কোন অভিযোগই তাঁর নামে আনা হয়নি বা আইনে সোপার্দ করা হয়নি।

এই সব রুই কাতলাদের কংগ্রেসী আমলে পূর্ণ স্বাধীনতা, চুরি চামারী জাল জোচ্চুরী ব্যাপারে, আর কোথায় এক গরীব ২ সের চাল কোঁচড়ে বেধে নিয়ে আসছে [illegible] সততা শৃঙ্খলা ও আইনের মর্য্যাদার প্রশ্ন তখন ওঠে। এরই নাম গান্ধীয় সত্যনিষ্ঠা, কংগ্রেসী সত্যধর্ম।

উড়িষ্যায় কংগ্রেসের বিরাট পরাজয়

ছয়টি মিউনিসিপ্যালিটিতে কংগ্রেস ★ প্রার্থীরা বিপর্য্যস্ত ★

কয়েকজনার জামানত জব্দ

বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হচ্ছে। উড়িষ্যা এতদিন কংগ্রেসের শক্ত ঘাটি বলে পরিচিত ছিল। হরে কৃষ্ণ মহ্‌তাব সরকারী খরচে প্রায়ই দিল্লী হতে উড়িষ্যায় পাড়ি মারেন কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করার জন্যে, যাতে জনসাধারণ কংগ্রেসকে ভোট দেয় তার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু এত প্রচার সত্ত্বেও উড়িষ্যার জনসাধারণ কংগ্রেসকে তার উচিত শিক্ষাই দিচ্ছে। সম্প্রতি উড়িষ্যার সাতটি মিউনিসিপ্যালটিতে নির্বাচন হয়ে [illegible] ভবানীপাতনম, বারিপদ, বালেশ্বর, পুরী ও তালচের এই ছয়টিতে কংগ্রেস প্রার্থীরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে কংগ্রেস কর্মীদের জামানত পর্য্যন্ত জব্দ হয়েছে। কেবল মাত্র কটক মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীরা কোন ক্রমে অধিক সংখ্যায় জিততে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তবুও এই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা এত সামান্য যে সেখানেও কয়েক বার চেষ্টা করেও চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। জনতার হাতে এই লাঞ্ছনার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। হরেকৃষ্ণ মহ্‌তাব ও বিশ্বনাথ দাসের দলের মধ্যে কামড়াকামড়ি দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। উড়িষ্যার মেহন্নতী [illegible] বামপন্থী নেতৃত্বের অধীনে সংগঠিত হয়ে মুমূর্ষু কংগ্রেসকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করান।

★ নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে শান্তি সংগ্রামের শক্তিবৃদ্ধি ★

[স্থায়ী শান্তির জন্য সংগ্রাম ওয়াশিংটন ও লণ্ডনের আজ্ঞাবাহী তল্পিদার সরকার বিরোধী আন্দোলন হতে বাধ্য। তাই নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে শান্তি আন্দোলন আজ ঐ সমস্ত দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণী বিরোধী সংগ্রামে রূপ নিচ্ছে। সেখানকার সরকারগুলিও মুখে শান্তির কথা বলে শান্তি আন্দোলনের গলা টিপে মারার চেষ্টা করছে আমাদের দেশের নেহেরু সরকারেরই মত। মধ্য প্রাচ্যের শান্তির সৈনিকরা সেই ধাপ্পায় ভোলে নি; আমাদের দেশেও নেহেরুর ধাপ্পা সম্বন্ধে জনতাকে সজাগ করতে হবে।—সম্পাদক, **গণদাবী**]

নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের শান্তির আন্দোলন ক্রমশ তীব্রতর ও ব্যাপকতর হচ্ছে। তুরস্কে, ইরাণে, লেবাননে, সিরিয়ায়, ইসরাইলে, ইরাকে ও মিশরে জাতীয় শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে। তাতে যোগদান করেছেন ট্রেড ইউনিয়ন, নারী সঙ্ঘ, যুব সঙ্ঘ, ছাত্র সঙ্ঘ, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বিবিধ সংগঠনের প্রতিনিধিরা। কমিটিগুলির মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মমতের লোক আছেন।

মার্কিন যুদ্ধবাজদের সামরিক রথের চাকার নিকট ও মধ্য প্রাচ্যকে বেঁধে ফেলার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত শান্তি সেনানীদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। তুরস্ক, ইসরাইল, গ্রীস, ইতালী, যুগোশ্লাভিয়া ও আরব দেশগুলি নিয়ে এক তথাকথিত "ভূমধ্যসাগরীয় চুক্তি" আসলে এক আক্রমণাত্মক ব্লক গঠনের এক সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ইস্তাম্বুলে মার্কিন কূটনীতিজ্ঞদের এক বৈঠকে এবং মাল্টায় ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক মুখপাত্রদের আর এক বৈঠকে উপরোক্ত ব্লক গঠন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ বছরের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ব্রিটিশ জেনারেল রবার্টসন ও মার্কিন সংস্করণ পররাষ্ট্রসচিব ম্যাকৃঘী নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে সফর করেছেন। উভয়েরই উদ্দেশ্য অভিন্ন। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ভাবী সভাযুদ্ধের কামানের খোরাক যোগাড় করা। কিন্তু তাঁদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে ঐ সব দেশের শান্তি সেনানীদের প্রচণ্ড বাধা।

তুরস্কে শান্তি সেনানীরা **ট্রুম্যান মতবাদ ও মার্শাল প্ল্যানের আসল রূপ উদ্ঘাটিত করে দিচ্ছেন।** ইস্তাম্বুলের বস্ত্রশিল্প শ্রমিক ইউনিয়নের এক বিশেষ অধিবেশনে ঘোষিত হয়েছে "মার্শাল প্ল্যানের ফলে বস্ত্রশিল্পে দারুণ সঙ্কট দেখা দিয়েছে। ... বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ..... জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এই নীতির কি অবসান ঘটানো হবে না?" তুরস্কের জনগণ সমরায়োজন ও সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করার দাবি জানিয়েছেন। একমাত্র ১৯৫১ সালেই ট্যাক্স রূপে তুর্কী জনগণের পকেট থেকে ২২০ কোটি লায়ার যাবে মার্কিন "উপদেষ্টাদের" নির্দ্দেশ অনুযায়ী সমরায়োজনের পেছনে।

মার্চ মাসে তুরস্কের ২১টি সহরে কোরিয়ার তুর্কী সৈন্যদল প্রেরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ সব জনসমাবেশের আওয়াজ ছিল "তুর্কী জনগণের সন্তানেরা কোরিয়ার বুকে রক্ত ঢালবে না" এবং মার্কিন স্বার্থে আমরা মরতে রাজি নই।" তুর্কী জনমতের দাবি উঠেছে তুরস্ক থেকে মার্কিন সামরিক কর্তাদের বহিষ্কৃত করার জন্যে। ইসামিরে ইঞ্জিন মেরামত কারখানার শ্রমিকেরা দেয়ালে পোষ্টার মেরেছেন: "আমেরিকানরা, তুরস্ক থেকে চলে যাও।"

ইরানে ক্রমবর্দ্ধমান শান্তি ও স্বাধীনতা আন্দোলনে জনগণ ক্রমেই বেশী করে অংশ গ্রহণ করেছেন। গত ২রা মার্চ মজলিসের সামনে (তেহরানে) এক জনসভা আহূত হয়। তাতে শ্রমিক, কারিগর, ছোটখাটো ব্যবসায়ী, ছাত্র ইত্যাদি মিলিয়ে ৩০ হাজার লোক যোগদান করেছিলেন। ঐ জন সভায় কোরিয়া ও তাইওয়ান থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণের ও চীনের প্রজাতন্ত্রকে ইরান কর্তৃক স্বীকৃত দানের জোর দাবি জানানো হয়। স্থানীয় শান্তি কমিটিগুলি বৃহৎ পঞ্চশক্তির মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের আবেদন (বিশ্ব শান্তি পরিষদের) স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান চালাচ্ছে। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ১ লক্ষ সই সংগৃহীত হয়েছে।

আরব দেশগুলির জনগণও অগৌণে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণের দাবি জানিয়েছেন—দাবি জানিয়েছেন সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, ফ্রান্সজোর্দান, সৌদী আরব, আলজিয়ার্স মরক্কো, টিউনিস, লিবিয়া ও মিশরের অবস্থিত সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করে দেবার জন্যে। বিশেষ করে মরক্কো ও মিশরে বিদেশী সৈন্য অপসারণের দাবি জানিয়ে জোর আন্দোলন চলছে।

৭০ বৎসর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জোয়ালে বাঁধা থেকে মিশরের জনগণ আজ ঔপনিবেশিক দশার অবসান ঘটাতে চান। ১৯৩৬ সালের অপমানকর **ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি বাতিল এবং মিশর ও সুদান থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণ করার জন্যে তারা জোর দাবী জানাচ্ছেন।** কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যান্য বড় সহরে জনসভা ও জনবিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে। বহু জনসমাবেশে গৃহীত ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের (সুয়েজ খাল ও নীল উপত্যকা থেকে) অজস্র প্রস্তাব এসে জমা হচ্ছে মিশরের পররাষ্ট্র দপ্তরে। কায়রোর পাঁচ হাজার ছাত্রের এক প্রস্তাবে মিশরে ও সুদানে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণকারী বলে গণ্য করার দাবি জানানো হয়েছে।

মরক্কোতে মার্কিন, ফরাসী, ও স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্ব বজায় রাখার **অপচেষ্টার জবাবে মরক্কোর জনগণ এক নতুন জাতীয় আন্দোলনের সুরু করেছেন।** সাম্রাজ্যবাদীরা মরক্কোকে এক সামরিক রণনৈতিক ঘাঁটি বানিয়েছেন। **মরক্কোর জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনের পেছনে আছে দুনিয়ার স্বাধীনতাকামীদের সমর্থন।**

সিরিয়া আর লেবাননেও শান্তি আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে। ঐ দুই দেশের প্রায় সমস্ত সহরে স্থানীয় শান্তি কমিটির জোর কাজ চলছে। শান্তি আন্দোলনের মধ্যে কৃষক ও শ্রমিকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন শেখ, মোল্লা, আইনজীবী, ডাক্তার ও বিজ্ঞানীর দল। বিখ্যাত লেবানিজ মুফতি হাবিব এল-ইব্রাহিম তাঁর শিষ্য মণ্ডলীর কাছে নামাজের সময় শান্তি আন্দোলনে তাঁর যোগদানের কারণ বিবৃত করে বলেছেন: "প্রচার করা হচ্ছে, শান্তি আন্দোলনে যাঁরা যোগদান করেছেন তাঁরা সব কমিউনিষ্ট। ভাল কথা! কমিউনিষ্টদের শান্তি রক্ষার মহান আদর্শ থেকে থাকলে তাতে আপত্তি জানাবার কী আছে? আমি কোনো দলের লোক নই। আমি সত্য ও ন্যায়ের প্রচারক। এইখানেই আমার আর শান্তি আন্দোলনকারীদের মধ্যে মিল রয়েছে। এখানেই আমার আর যুদ্ধের প্রচারকদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।"

ব্রিটিশ জেনারেল রবার্টসনের সফর কালে সিরিয়া ও লেবাননের শান্তি সেনানীরা তাঁদের সংগঠন শক্তি ও অনমনীয় সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়েছেন। রবার্টসনকে আরব জাতিগুলি নিকট প্রাচ্যের ম্যাকআর্থার বলে ডাকে। **সিরিয়া ও লেবাননের জনগণ ব্রিটিশ জেনারেলকে সম্বর্দনা জানিয়েছেন প্রতিবাদ সভা ও গণবিক্ষোভের মধ্য দিয়ে।** তাদের আওয়াজ ছিল: "রবার্টসন, চলে যাও।" "রবার্টসন যুদ্ধ ও মৃত্যুর দূত।" "আরব জগতের শত্রু যুদ্ধবাজরা নিপাত যাক।" ব্রিটিশ জেনারেলের সফরকে যুদ্ধায়োজনের ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করে সিরিয়া ও লেবাননের বহু পত্রিকায় শ্রমিক, ছাত্র ও মেয়েদের বিস্তর চিঠি ছাপা হয়েছে। ঐ দুই দেশের শান্তি কমিটিগুলি যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে আরো জোর সংগ্রামের জন্যে, সিরিয়া ও লেবাননের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আরো বেশি সতর্ক হবার জন্যে জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণী তাঁদের ওয়াশিংটন ও লণ্ডনের প্রভুদের হুকুম মতো শান্তি সেনানীদের উপর অকথ্য নির্য্যাতন চালাচ্ছেন। কিন্তু শান্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার গণ আন্দোলন তাঁরা কিছুতেই দমন করতে পারছেন না পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির জনগণও শান্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে বুঝে নিয়েছেন। **ওয়ার্স কংগ্রেসের বাণী—"শান্তি আপনা থেকে আসবে না—শান্তি আমাদের লড়াই করে অর্জন করতে হবে।"** কোটি কোটি নরনারী এই বানীর মর্ম উপলব্ধি করেছেন। তাই যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে প্রচণ্ড শান্তি আন্দোলন। —টাস

চিঠিপত্র

গণদাবীর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়—

আমি গণদাবীর একজন নিয়মিত পাঠক ও সমর্থক এবং আমি মনে করি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ঘোলাটে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থায়—গণদাবীই জনতাকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে। তাই গণদাবীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে কয়েকটি কথা আমি বলতে চাই।

৩য় বর্ষ ১৪শ সংখ্যা গণদাবীতে পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সম্মেলনের যে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে তাতে সম্মেলন সম্বন্ধে সব কিছু খবরই আছে—শুধু বাদ পড়েছে Institute of Art & Culture এর উদ্দ্যোগে প্রদর্শিত প্রাচীর চিত্র প্রদর্শনীটির কথা। ভারতবর্ষের শান্তি আন্দোলনে এদের প্রাচীর চিত্রগুলো বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। অথচ আপনাদের রিপোর্টারের মনে এই ছবি গুলো কোন দাগই কাটেনি বলে মনে হয়—এ একটা অনুতাপের বিষয়। অন্যান্য সংবাদপত্রগুলোতে এই প্রদর্শনীটির কোন নাম মাত্র না থাকায় আমি দুঃখিত হয়েছিলাম, আশা করে ছিলাম গণদাবী এ অভাব পুরন করবে।

যাই হোক আপনার কাছে আমার অনুরোধ আপনারা আগামী সংখ্যা থেকে এসব বিশয়ে সচেতন হোন। ইতি শুভাকাঙ্খী

শিবেন কুণ্ডু

ত্রুটী স্বীকার

গত মে মাসে অনুষ্ঠিত পশ্চিম বংলা শান্তি সম্মেলনে ইনসটিটিউট অফ আর্ট এণ্ড কালচারের দ্বারা প্রদর্শিত চিত্র বিভাগটির কথা আমরা উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলাম শান্তি সম্মেলনের রিপোর্ট প্রকাশ কালে। তজ্জন্য আমরা আন্তরিকভাবে লজ্জিত,—সম্পাদক, গণদাবী

শান্তি শিবিরের আত্মসমালোচনা

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

national, treasonable character of the policy of the bourgeois governments."। সুতরাং ভারতবর্ষের শান্তি আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে নেহেরু সরকারের নীতিকে আক্রমন না করে উপায় নেই। ভারতীয় শান্তিকামী জনতার কাছে প্রমাণ করতেই হবে নেহেরু সরকারের আসল চরিত্র। অথচ শান্তি কংগ্রেসে কমুনিষ্ট পার্টির যে মনোভাব প্রকাশিত হল তাতে মনে হয় তাঁরা বিশ্বাস করেন—নেহেরু নিজে শান্তির সৈনিক, তাঁর কোন কোন কাজ বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রনোদিত। এই কথা মনে করার কারণ নেহেরুর কোরিয়া সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথা, চীন গণরাষ্ট্রকে নিরপত্তা পরিষদে আসন দেবার ইচ্ছা, আনবিক বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে উক্তি প্রভৃতি তথাকথিত শান্তিকামী প্রচেষ্টাগুলিকে বেশ ফলাও করে প্রচার করা হল অথচ নেহেরুর শান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে প্রকাশ করা হয়নি। এমন কি মনে করা হয়ে থাকে নেহেরু শান্তির সৈনিক, শুধু তার কিছু দোমনাভাব আছে। সেই দোমনাভাব দূর হতে পারে এবং তা করলেই তিনি পুরাদস্তুর শান্তিরক্ষকে পরিণত হবেন। এই ধরণের বিশ্লেষণ দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রমান। নেহেরু ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী, সুতরাং ব্যক্তি নেহেরু এবং তাঁর রাষ্ট্রনীতির মধ্যে একটা কাল্পনিক সীমারেখা টেনে নেহেরুকে জনতার সামনে শান্তির সৈনিক হিসাবে তুলে ধরা শুধু ভুল নয়, শান্তি আন্দোলনের পায়ে কুড়ুল মারা। কে না জানে ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতি বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ডলার সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যাপারে বৃটীশ নীতির প্রকাশ ও মার্কিননীতির ওপর চাপ। কম্যুনিষ্ট পার্টিও এ কথাটা মানেন, কেন না তাঁদের সাম্প্রতিক Draft Programme (সম্ভবতঃ এই Programme C.P.I র Election Manifesto—সম্পাদক, গণদাবী) তেও বলা হয়েছে—"While playing on the rivalries between nEgland and America to its own advantage in certain circumstances, the Government of India essentially carries out the foreign policy of British Imperialism." তাই যখন সত্যি তখন নেহেরুকে শান্তির সৈনিক বলার অর্থ এটলি সরকারকেও শান্তির পাহারাদার হিসাবে দেখান। তা কি ঠিক ?

একথা অবশ্য সত্য যে, পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দকে আমরা শান্তি আন্দোলনের স্বপক্ষে কাজে লাগাব এবং সাম্রাজ্যবাদীদের দোদুল্যমান সমর্থককে আমাদের নীতির দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের পাকাপোক্ত ঘুঁটিতে পরিণত করব না। অর্থাৎ নেহেরু যে শান্তির ভাব দেখাচ্ছেন তার পূর্ণ সুযোগ নিতে হবে। এ সুযোগ কেমন করে নেওয়া যায়? জনতাকে বোঝাতে হবে—নেহেরু বলছেন নেহেরু শান্তি চান, আমরা অবিশ্বাস করি না কিন্তু শান্তি চাইলে তাঁকে শান্তির জন্য লড়তে হবে বিশ্বশান্তি কংগ্রেস যে একান্ত ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি করেছেন তার ভিত্তিতে। তা তিনি যখন করবেন না তখনই দেশবাসীর সামনে প্রমাণ হয়ে যাবে তাঁর আসল শান্তি বিরোধী ভূমিকা। আর তা না করে এখন যেভাবে তাঁর প্রশস্তি গাওয়া হচ্ছে তাতে জনমনে তাঁর সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই চেষ্টা নেহেরুও করছেন জনতাকে সক্রিয় শান্তি আন্দোলন থেকে দূরে রেখে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদী শক্তিকে শক্তিশালী করতে। একথা ঠিক জনতার সচেতনতার মাত্রার স্তরের ওপর ভিত্তি করেই আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, খুব বেশী এগুনো আওয়াজ তোলা অতিবিপ্লবী খোকামীপনা। নেহেরুর শান্তিকামী ভূমিকা সম্বন্ধে এখনও জনতার সঠিক ধারণা হয় নি। সুতরাং তাকে যুদ্ধবাদী বলে প্রচার করলে প্রকৃত শান্তিকামী শক্তির একটা বড় অংশ আমরা হারাব। এ সবই সত্যি কথা। কিন্তু যুদ্ধবাদী না বললেই যে শান্তির সৈনিক বলতে হবে—এ যুক্তি অচল। বরং তার সম্বন্ধে কোন রকমে মোহ সৃষ্টি না করে তার মুখোস ছিঁড়ে ফেলতে হবে দৈনন্দিন কাজের মারফৎ। তাই তার শান্তিবিরোধী নীতিগুলির ওপর জোর দিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন চালাতে হবে এই বলে যে প্রকৃত শান্তিকামী হলে এই এই জিনিষ করতেই হবে। এইভাবে চলা দূরে থাকুক কমুনিষ্ট পার্টি অন্যান্য ব্যক্তিবিশেষের চেয়ে নেহেরু প্রশস্তিতে বদ্ধপরিকর। যেখানে কোন দলভুক্ত নয় এমন লোক, সাধু দলভুক্ত ব্যক্তি ভারতসরকারের শান্তি বিরোধী-নীতিতে উষ্মা প্রকাশ করলেন সেখানে ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টির বক্তার বক্তৃতার সারমর্ম দাড়ায় 'We must strengthen the hands of Nehru' বোম্বাইয়ে এই জিনিসটা প্রকটভাবে চোখে পড়েছে।

ভারতের শান্তি আন্দোলনকে এই বিচ্যুতি থেকে কাটিয়ে তুলতে হবে কম্যুনিষ্ট ও শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলির।

সর্বশেষে কম্যুনিষ্ট ও শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলির বর্তমান বিশ্ব শ্রেণীসম্পর্কের কথা ভালভাবে চিন্তা করা দরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার অবস্থা থেকে এখনকার অবস্থা মূলগতভাবে পৃথক। এখন পুঁজিবাদী শিবিরের মধ্যে অন্তবিরোধ থাকলেও তারা একত্রভাবে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। গোটা দুনিয়া দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত। এরই পারিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে কাকে কতদূর পর্যন্ত পাওয়া যাবে। শান্তি আন্দোলনে তা না বুঝলে শান্তি সংগঠন দুর্বল হবে, শান্তির শক্তি সমাবেশ ব্যর্থ হবে। শান্তি আমরা চাই কিন্তু তা আমাদের অর্জন করতে হবে, আপসে আসবে না। দেশজোড়া শান্তি আন্দোলন তাই আমরা গড়ে তুলব। আর বিশ্বজোড়া শান্তি আন্দোলন যত জোরদার হবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজের দল তাদের মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে দেখে ততই মরিয়া হয়ে উঠবে। সে ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর দল আমাদের ঘাড়ে যুদ্ধ চাপাতে চাইবেই। জনতা সচেতন, সজাগ না থাকলে তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা যাবে না। কমরেড সুসলভ তাই বলেছেন—"The experience of history teaches that the more hopeless the position of imperialist reaction, the more frantic it becomes and the greater to the danger of its launching into military venture." এবং তখন শান্তিকামী জনতাকে প্রতিরোধ যুদ্ধের মারফৎ যুদ্ধকে চিরতরে খতম করতে হবে। এই পরিপেক্ষিতেই শান্তি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। যতদিন যুদ্ধ ঘাড়ে চাপিয়ে না দেয় ততদিন শান্তি আন্দোলনের কাজ হবে যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী শক্তিকে এমনভাবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সংহত করা যাতে যদি আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপান হয় তাহলে যেন তাকে খতম করে জনরাষ্ট্র কায়েম করতে পারি। শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলির সেই হল কাজ। সুতরাং নেতৃত্বের প্রশ্ন সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। শান্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব আনতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে 'loose amorphous individual'দের হাতে নয়। বোম্বাইয়ে এই বিচ্যুতিও চোখে পড়েছে।

মালকাটার

বিশ্বনাথ

আমরা মাল কাটার,
কয়লা কাটি আমরা
খনির গভীর অন্ধকারে
বিশ্রাম মুখর রাতে,
আর আলোক উজ্জ্বল দিনে।
ছবাজে, দু বাজে,
রাত দশ বাজে পাল্লার পর্যায়ক্রমে।
বিবর্তিত হয়ে চলে
আমাদের শোষিত জীবন
পৃথিবীর দ্বিমুখী গতির
চক্র আবর্তনে।
আমরা কয়লা কাটি
আর বোঝাই করি গাড়ি
তোমরা নিয়ে যাও ছিনিয়ে
আমাদের শ্রমের ফসল
বাড়াও ব্যাঙ্ক ব্যালান্স
আর কারখানার বাড়ি।
আমাদের জাতি নাই, জ্ঞাতি নাই,
আমরা গোত্র বর্ণ হীন।
আমরা মাঝি, বাউরি, ভুঁইয়া,
দোসাদ, চামার, বিলাস পুরিয়া,
আমরা হিন্দু, মুসলমান
আমরা গোরখ পুরিয়া।
তোমাদের সভ্যতার আলোক
পাইনি আমরা
সমাজে পিছনে পড়ে আছি—তাই
আমাদের শুভ বুদ্ধি জাগাতে
তোমাদের চেষ্টার তুলনা নাই।
কি চেষ্টাই না কর তোমরা
আলতোভাবে হাত ধরে
আমাদের টেনে তোলবার।
তাই আমরা
আধপেটা খেয়ে কয়লা কাটি
তাই আমরা বেইজ্জত মাল কাটার।
তোমরা বেড়ে উঠেছে ফুলে ফেঁপে
আমাদের কামাই খেয়ে খেয়ে।
তাই ভাটীর নেশায় রেখেছ ডুবিয়ে।
ভাল মানুষের মত খালি দাও
ভগবানের আর ধর্মের দোহাই।

তোমরা দেখেছ আমাদের
অনেক দিন ধরে—অনেক কাল।
কয়লার কালিতে মাখা
কোমরে কৌপীন আঁটা
দেখেছ আমাদের নগ্ন দেহ—প্রেতের কংকাল।
কিন্তু, তোমরা ত দেখ নাই
আমাদের চোখের দীপ্তিতে
ভেসে উঠে
আকস্মিক বিস্ফোরনের বিজলীর ঝলক।
দেখ নাই তোমরা
আমাদের ইসপাতী—মাসল
আর গাঁইথীর ফলক
কি প্রচণ্ড আঘাতে
ভেঙে ফেলে টুকরো টুকরো করে
যুগ-যুগ ধরে
দানা বেঁধে গড়ে উঠা
কয়লার কঠিন পুরু স্তর।
কয়লার পুরু স্তরের মত
জমাট বেঁধে উঠা
তোমাদের টাকার পাহাড়
আকাশ গেছে ছাড়িয়ে,
শোষণের শেষ সীমারেখা গেছে পেরিয়ে

আর তোমাদের দেব না কোন অবসর।
কয়লা খাদে হঠাৎ জলে উঠা
মার্শ গ্যাসের মত
জলে উঠব আমরা
তোমাদের কোন এক অসতর্ক ক্ষণে
প্রচণ্ড বিস্ফোরণে
গুড়িয়ে দেব তোমাদের
দোতালা সমাজ, তার সৃষ্টি
তোমাদের স্বার্থে তৈরী দ্বিমুখী কৃষ্টি
নিঃশেষ করে জ্বালিয়ে দেব,
পুড়িয়ে দেব তোমাদের সকলকে।
গ্যাসের ধোঁয়ার মত রবে তোমরা
বর্তমানের দুঃস্বপ্নে,
ভবিষ্যের বিস্মরণে।

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ

সৈন্যবাহিনীর সাথে যুক্ত করে চেক-কম্যুনিষ্ট পার্টি দেখিয়েছিল যে তারা পূর্ব দেশের সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী তথা ষ্ট্যালিনের হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছে।

সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর বিজয়ী অগ্রগতির ফলে চেক-কম্যুনিষ্ট পার্টি পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও বুর্জোয়া শ্রেণীর চেকোশ্লোভাকিয়াকে পুঁজিবাদী শোষণে আটকে রাখবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরোধী সংগ্রামে অতি সহজেই জয়যুক্ত হয়।

১৯৪৫ সালের ৯ই মে পার্টির কার্য্যাবলীর এক ঐতিহাসিক সূচনা এনে দেয়। বিজয়ী সোভিয়েট সৈন্য চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণকে হিটলারী কবল থেকে মুক্ত করে দিয়ে শুধু মাত্র স্বাধীনতার সমস্যাকেই সমাধান করেনি সুখী ভবিষ্যত গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছিল। জনসাধারণের অগ্রগামী বাহিনী শ্রমিকশ্রেণী নয়া গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নিজ হস্তে সক্ষমভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করল; বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণী-আধিপত্য বিসর্জ্জন করে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার সাধনের ভেতর দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া প্রজাতন্ত্র সমাজতন্ত্রের প্রতি অগ্রসরমান নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হল। জাতীয় ফ্রন্টে সংযুক্ত বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ান অর্থাৎ সহর ও গ্রামের মেহন্নতী জনতার একতার প্রতি আস্থা স্থাপন করে পার্টি কোসি কার্য্যক্রম (Kosice Programme) কে কার্য্যকরী করার প্রচেষ্টা করতে লাগল। সেই কার্য্যক্রম হচ্ছে:— (১) বৃহৎ এবং প্রয়োজনীয় ফ্যাক্টরী, মিল, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেনস কোম্পানী প্রভৃতির জাতীয়করণ। (২) জমিদারী সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত করণ। এবং (৩) জাতীয় কমিটি ও বৃহৎ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের ভিত্তিতে নূতন রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি স্থাপন করা।

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে বিপ্লবী সাফল্যের আলোচনা প্রসঙ্গে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে এই বিপ্লব যেটা সোভিয়েট মুক্তিফৌজ সমাপ্ত করেছিল সেটা জাতীয় গনতান্ত্রিক বিপ্লবের গণ্ডী পার হয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পৌছেছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার মেহন্নতী জনতা একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্যেই সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি অত্যন্ত সচেতন ছিল যে ১৯৪৫ সালের মে মাসের পর থেকে যে ঐতিহাসিক পথ বেয়ে পার্টি অগ্রসর হয়েছে সেটা ছিল লেনিন ষ্টালিনের শিক্ষায় প্রদর্শিত বিপ্লবী ও বলশেভিক পথ। এই বিপ্লবী সচেতনতা তখনই প্রদর্শিত হয়েছিল যখন পার্টি নয়া গণতন্ত্রকে (Peoples Democracy) শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের একটি রূপ হিসেবে সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিল—যে একনায়কত্ব গনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে পৌছিবার সময়ে হৃতসর্ব্বস্ব বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধকে বিনষ্ট ক'রে, পুঁজিবাদী সম্পর্ককে উচ্ছেদ ক'রে—সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পুনর্গঠনের ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

মেহন্নতী জনতা এবং শ্রমিক শ্রেণীর একান্ত সহযোগীতায় চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি বুর্জোয়া শ্রেণী এবং বিদেশী শক্তি চেকোশ্লোভাকিয়ার নয়া গণতান্ত্রিক প্রথা বিনষ্ট করে পুঁজিবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৮ সালে যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছিল তাকে সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পরাজয় সমাজতন্ত্রের পথকে আরও সুগম করল। পরবর্ত্তী অগ্রগতি নূতন বিপ্লবী কার্য্যক্রম দ্বারা চিহ্নিত ছিল যেমন:— শিল্পের জাতীয় করণ সম্পূর্ণ করা, ব্যবসায়, ছোট খাট শিল্প, কুটীর শিল্প (?) প্রভৃতিতে সমাজতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করা, এবং 'এগ্রারিয়ানদের' হাত থেকে জমি বাজেয়াপ্ত করা। মেহন্নতী জনতার ঐক্যবদ্ধ শক্তির পরিচয় সেদিন সর্বত্র ফুটে উঠেছিল। ১৯৪৮ সালের ৮ই মে কম্যুনিষ্টদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নূতন গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে নূতন জাতীয় পরিষদ গড়ে উঠল। ঐ সালেই ১৪ই মে কমরেড গটওয়াল্ড চেকোশ্লোভ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন।

১৯৪৮ সালের মে মাসে পার্টির নবম কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির নীতি গৃহীত হ'ল। প্রথম দুবছরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পর পাঁচ বছরের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হ'ল।

কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে শিল্পে এবং ব্যবসায় সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতি, জনসাধারণের জীবন ধারণের মানের উন্নতি, কৃষির উন্নতি, সাংস্কৃতিক জীবনে নূতন মানুষ সৃষ্টির এবং গোটা দেশটাকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। চেকোশ্লোভাক জনসাধারণ এই সাফল্যের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের নিঃস্বার্থ, সৌহার্দ্দপূর্ণ দানের জন্য চিরকৃতজ্ঞ। কম্যুনিষ্ট পার্টি অবগত আছে যে বিচ্যুত লোকদের কাছ থেকে অধিকতর প্রতিরোধ আসবে।

পার্টি রাষ্ট্রের সুদৃঢ় নিরাপত্তার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রকে রক্ষার জন্য সৈন্য বাহিনী গঠনের জন্য বিশেষ দৃষ্টি দিচ্ছে। অধুনা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল স্লিঙ (Sling) সারমোভা (Svermova) এবং ক্লিমেন্টিশ (Clementis) প্রভৃতিদের মুখোস খুলে পড়েছে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত ষড়যন্ত্রই বিফল হয়েছে। চেকোশ্লোভাক জনগণ নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বিহারে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের কর্মীদের উপর ব্যাপক পুলিশী আক্রমণ

বহু কর্মী গ্রেপ্তার এবং অফিস ও বাসস্থান খানাতল্লাসা

সিংভূম জেলায় পুলিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে জন নেতাদের বিবৃতি

সারা ভারত সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বিহার রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড শঙ্কর সিং, বিহার সংযুক্ত কিষাণ সভার পক্ষে কমরেড রামবদন রায় এবং বিহার ইউ-টি-ইউ-সির পক্ষে কমরেড প্রীতিশ চন্দ সিংভূম জেলার সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের কর্মীদের উপর পুলিশের জুলুমের নিন্দা করিয়া একযুক্ত বিবৃতিদিয়াছেন

"কংগ্রেসী সরকারের ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মন্ত্রী সভার নেতৃত্বে বিহার পুলিসের বামপন্থীদের বিরুদ্ধে নির্য্যাতন কিছু নূতন ঘটনা নয়। কিন্তু সম্প্রতি সিংভূম জিলায় এই নির্যাতন চরমে পৌছিয়াছে। গত ৫ই মে ঘাটশিলায় সিংভূম জেলা সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের কার্য্যালয় এবং সিংভূম জিলা সংযুক্ত কিষাণ সভার কার্য্যালয়ে সশস্ত্র পুলিস ও সি আই ডির অভিযান হয়। এইরূপ খবর পাওয়া গিয়াছে। সে সময়ে উপরোক্ত কার্য্যালয়ে কোন কর্ম্মী উপস্থিত না থাকায় পুলিস স্থানীয় কোন কংগ্রেসী দালালের সাহায্যে তালা ভাঙ্গিয়া অফিস গৃহে প্রবেশ করে এবং খানাতল্লাসীর নামে সমস্ত অফিস ঘর এবং কম্যিউন তছনছ করে। ঐ রাত্রেই সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বিহার রাজ্য কমিটির সভ্য এবং সিংভূম জিলা সংযুক্ত কিষাণ সভার সভাপতি কমরেড হীরেন সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৬ই ও ৭ই মে উপরি উপরি ২ দিন জেলার বিভিন্ন থানা ও গ্রামে সশস্ত্র পুলিশ হানা দিয়া সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বিভিন্ন কর্ম্মীদের বাড়ি চড়াও করে। প্রকাশ কাড়াডোবাতে কমরেড ভূদেব সীট ও রাধানাথ চ্যাটার্জ্জির বাড়ী খানাতল্লাসী হয় এবং কমরেড ভূদেবকে গ্রেপ্তার করা হয়। পটকা থানায় কমরেড মধু সুদন মাহাতো ও সুধীর দাসের বাড়ীতে খানাতল্লাসী চলে। কমরেড সরকারকে ও কমরেড ভূদেবকে হাতকড়ি দিয়া জামসেদপুর চালান করা হয়।

আমরা কংগ্রেসী পুলিসের এই ব্যাপক সন্ত্রাসনীতি ও জুলুমের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি ও ধৃত কমরেডদের সকল অভিযোগ হইতে অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিতেছি। আমরা পরিষ্কারভাবে জানি এই ব্যাপক দমননীতির পিছনে আছে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের নিশ্চিত পরাজয়ের ভয়। এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সিংভূম জেলা কিষাণ সম্মেলন ঘাটশিলায় হইবার কথা ছিল। এই কিষাণ সম্মেলনের প্রস্তুতি কার্য্যে পার্টি এবং কিষাণ সভার কর্ম্মীরা যে ব্যাপক প্রস্তুতি ও প্রচার করিতেছিলেন তাহার ফলে ভীত হইয়া স্থানীয় জমিদার, জঙ্গল কনট্রাকটার ও কংগ্রেসী চোরাবাজারীরা পুলিসের সাহায্যে এই দমননীতি চালাইয়াছে। কিন্তু এই অত্যাচারে কিষাণ আন্দোলন, জঙ্গল অধিকার আন্দোলন আরও তীব্র হইবে। এখানে উল্লেখ করিতে চাই যে কমরেড হীরেন সরকারকে দুই বছর পূর্ব্বে মৌভাণ্ডারের তামা কারখানার বিখ্যাত ধর্ম্মঘটের সময়ে সিংভূম হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। ইহার পরেও গত বছর তাহাকে দুইবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রতিবারই তিনি কোর্ট হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। আজও সেখানকার বহু কিষাণ কর্ম্মী জঙ্গল আইনে অভিযুক্ত আছেন। কিন্তু পুলিস অত্যাচার সত্বেও সিংভূম জেলায় গণ আন্দোলন ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে।

"আমরা এই অবস্থায় সিংভূম জেলার এবং সমস্ত প্রদেশের জনসাধারণের কাছে এই নির্য্যাতন ও দমননীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতে আবেদন করিতেছি। প্রদেশের সমস্ত বামপন্থীদের কাছে আবেদন করিতেছি তাঁহারা এক যোগে সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করুন।"

আজকে ৩০শ বার্ষিকী পালন করতে গিয়ে চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি তার সমস্ত শক্তি নিম্নোক্ত কার্য্যাবলী অর্থাৎ শান্তির সংগ্রাম ও পঞ্চশক্তির শান্তি চুক্তি স্বপক্ষে এবং পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরনের বিরুদ্ধে নিয়োগ করছে। এর জন্য হিটলারী জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরনে ইচ্ছুক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের মারনাত্মক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে চেক জনসাধারণের সংঘবদ্ধ ইচ্ছা এবং প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পাওয়া প্রয়োজন। আজকে বিশ্বশান্তির অগ্রদূত সোভিয়েট ইউনিয়ান এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে বন্ধন আরোও দৃঢ়তর করবার জন্য পার্টি আজ সবিশেষ সচেষ্ট।

চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হবার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপের ভেতর দিয়ে ত্রিংশতি বার্ষিকি পালন করছে।

পার্টি আজ ঘোষনা করছে যে তারা ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্র রচনা করে চলেছে। সমাজতন্ত্রের অধীনে চেক জনসাধারণ এক মহান আনন্দপূর্ণ সুখী জীবন যাপন করছে। সকলে সম্মানের সাথে পার্টির পতাকা শীর্ষে ধারণ করছে। চেক জনসাধারণ কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির নেতৃত্বে এবং কমরেড গটওয়াল্ডের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাবার জন্য সংঘবদ্ধ হচ্ছে।

ত্রিংশতি বার্ষিকী পালন করতে গিয়ে চেক কম্যুনিষ্ট পার্টি তার আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অগ্রদূত সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টি ও মহান নেতা ও পথপ্রদর্শক কমরেড ষ্টালিনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। (ফর এ লাষ্টিং পিস, ফর এ পিপিলস্ ডিমোক্র্যাসি ২০নং হতে সুকোমল দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক সংক্ষেপিত)

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক পরিবেষকপ্রেস, ২৩, ডিক্সনলেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।